গত শতাব্দীর অন্যতম সেরা ফুটবলার দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনার জন্ম ১৯৬০ সালে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আয়ার্সে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান মারাদোনা মাত্র ১২ বছর বয়সে দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ম্যাচের বিরতিতে ফুটবলের কারিকুরি দেখিয়ে খেলোয়াড় হিসেবে সুযোগ পায়। চারবারের বিশ্বকাপার মারাদোনার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ১৯৮৬ সালে ফিফা বিশ্বকাপ জয় করে। পরে জাতীয় দলের কোচের দায়িত্বও পালন করেছিলেন নাপোলির ফুটবলার। একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দু'বার ট্রান্সফার ফি–র বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন। যদিও মাদকাসক্তি এবং ব্যক্তিগত জীবনে একাধিক বিতর্ক সঙ্গী হয়ে রয়েছে দিয়েগোর।

আজ

শুক্রবার, ১৩ কার্তিক ১৪২৭ ■ ৪১ বর্ষ ■ ১৬০ সংখ্যা

শৈলাবাসে মহামহিম

সবকিছুর কার্যকারণ থাকে। সমস্ত পদক্ষেপের পিছনে যৌক্তিকতাও থাকা দরকার। তবে এটাও ঠিক যে, কেউ ভুল কার্যকলাপ করলে সে নিজের মতো করে সাফাই দেয়। কিন্তু বিষয়টি যদি জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত হয়, তাহলে বাস্তবের কষ্টিপাথরে সেই সাফাই যাচাই করে দেখাই নিয়ম। প্রসঙ্গটা উঠছে পশ্চিমবঙ্গের মহামহিম রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের আচমকা পাহাড় ভ্রমণের ইচ্ছা প্রকাশ্যে আসায়। এমন নয় যে, পশ্চিমবঙ্গের কোনও রাজ্যপাল এই প্রথম পাহাড়ে যাচ্ছেন। এমন নয় যে, শীতের সময় কোনও রাজ্যপাল দার্জিলিংয়ে ক'দিন থেকে ঠান্ডার আমেজ নিতে এই প্রথম যাচ্ছেন। এমন নয় যে, রাজ্যপালের পাহাড় যাওয়ায় বেনজির কিছু আছে। রাজ্যপাল হিসেবে রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে যাওয়া তাঁর অধিকারের মধ্যে পড়ে। পাহাড় সফরে তাই কারও কোনও আপত্তি বা বাধা থাকতে পারে না।

প্রশ্নটা উঠতই না যদি তাঁর সফরসূচি এত ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা না হত। রাজ্যপালের সফরসূচি নিতান্তই প্রশাসনিক বিষয়। এতে সাধারণত বড় কোনও সংবাদের উপাদান থাকে না। জগদীপ ধনকর আসলে প্রচলিত প্রথা বা রাজ্যপালের কাজকর্ম সম্পর্কে অতীতের সমস্ত ধারণাটাই উলটে দিয়েছেন। সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে যত নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে, টেলিভিশনে তাঁর জন্য যত ফুটেজ ব্যবহৃত হয়েছে, রাজনৈতিক নেতাদের মন্তব্যে যত রাজ্যপালের কার্যকলাপ আলোচিত হয়েছে, তা অতীতে কখনও হয়নি। তার মানে এই নয় যে, স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল পদ্মজা নাইডু থেকে শুরু করে জগদীপ ধনকরের ঠিক পূর্বসূরি কেশরীনাথ ত্রিপাঠী পর্যন্ত কেউ তেমন সক্রিয় ছিলেন না।

বরং এঁদের অনেকে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। কেউ কেউ প্রশংসিত হয়েছেন, কেউ আবার সমালোচিত হয়েছেন। ত্রিভুবন নারায়ণ সিংয়ের মতো কাউকে নিয়ে বিতর্কও দানা বেঁধেছে। কিন্তু জগদীপ ধনকরের মতো আগ বাড়িয়ে আর কেউ বিতর্কে জড়াননি। তাঁকে কেন্দ্র করে চলতি বিতর্কের কারণ, রাজ্যপালের পাক্কা একমাস পাহাড়বাসের ঘোষণা। দার্জিলিংয়ে রাজ্যপালের আবাস আছে। তা গ্রীষ্মকালীন আবাস বলে পরিচিত। তাও অনেক রাজ্যপাল সেখানে গিয়ে কখনও থাকেননি। থাকলেও এতদিন নয়। এবার রাজ্যপালের পাহাড় সফর কিন্তু অবকাশযাপন নয়। বরং ইঙ্গিত মিলছে, তাঁর এই পাহাড়বাস হবে কর্মসূচিতে ঠাসা। রাজভবনের পদস্থ আধিকারিকরাও রাজ্যপালের বাসকালে দার্জিলিংয়েই থাকবেন। পুরো নভেম্বর মাসটা রাজভবনের প্রশাসন চলবে দার্জিলিং থেকে।

কেন আচমকা এমন অভূতপূর্ব সফরসূচি? এর কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনও মেলেনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি শুধু জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের মন বোঝা তাঁর মনোগত বাসনা। এজন্য উত্তরবঙ্গের মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি। এই যুক্তিতে অন্যায় কিছু নেই। কিন্তু সেজন্য পুরো রাজভবন নিয়ে গিয়ে সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল না। এই কোষাগার তৈরি হয় জনগণের করের টাকায়। ফলে জনগণ পাইপয়সার হিসাব চাওয়ার হকদার। তাছাড়া রাজ্যপাল একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ। না নীতি নির্ধারণ, না কোনও প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যকর করার অধিকারী তিনি। ফলে উত্তরবঙ্গের মন বুঝে তাঁর পদের পক্ষে কোনও পদক্ষেপ করা আইনত সম্ভবই নয়। বড়জোর তিনি কিছু সুপারিশ করতে পারেন। সেই সুপারিশও রাজ্য সরকারকে না করলে লাভ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্য প্রশাসনকে টপকে কেন্দ্রের পক্ষে না উন্নয়ন করার উপায় আছে, না কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়ার আইন আছে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে জগদীপ ধনকরের সম্পর্ক অনেকটা তেলে–জলের মতো, মিশ খায় না। তাছাড়া রাজ্যে গণতন্ত্র নিশ্চিত করাও রাজ্যপালের পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না সরকারের সেই সদিচ্ছা থাকে। জোর করে রাজ্যপালের পক্ষে রাজ্য সরকারকে দিয়ে সেই কাজ করা সম্ভব নয়। তাহলে দার্জিলিংয়ে বসে তিনি কোন কাজটা করতে চাইছেন, তা জানতে চাওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে কি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনও শলা বাস্তবায়িত করতে ধনকর সাহেবের এই দীর্ঘ পাহাড়বাস? সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী কিছু করার কথা রাজ্যপালকে বলতে পারেন না।

বাকি রইল এমন কোনও সম্ভাবনা যা প্রকাশ্যে বলা সম্ভব হচ্ছে না। সত্যি যদি এমন কোনও সম্ভাবনা থাকে, তবে তার চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত হতে পারে না। এই সফর নিয়ে হাওয়ায় এমন ইঙ্গিত ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে অনভিপ্রেত কিছুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যপালের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ থাকার কথা নয়। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যের পরিস্থিতি দিল্লিতে জানাতে পারেন মাত্র। তাঁর কার্যকলাপে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের আভাস থাকা একেবারেই কাম্য নয়।

অমৃতধারা

শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দুর্বল করে দেয়, তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল। দাঁড়ান এবং আপনার মধ্যেকার দেবত্বকে চিনতে শিখুন। অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা কর না, তুমি যা করতে পার সেটা কর কিন্তু অন্যের উপর আশা কর না। সমাজ অপরাধীদের কারণে খারাপ হয় না বরং ভালো মানুষদের নীরবতার কারণে হয়। তারা একাই থাকেন, যাঁরা অন্যদের জন্য জীবিত থাকেন। একটি সময়ে একটিই কাজ কর এবং সেটা করার সময় নিজের সব কিছুই তার মধ্যে ব্যয় করে দেও। নিজেকে দুর্বল মনে করা সব থেকে বড়ো পাপ। সত্যকে হাজার আলাদা আলাদা উপায়ে বলা যেতে পারে, তারপরেও সব কিছু সত্যই থাকে। একটি রাষ্ট্রের অগ্রগতি জানার সবচেয়ে ভালো উপায় হল সেই রাষ্ট্রে নারীর অবস্থান।

–স্বামী বিবেকানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৭৫০

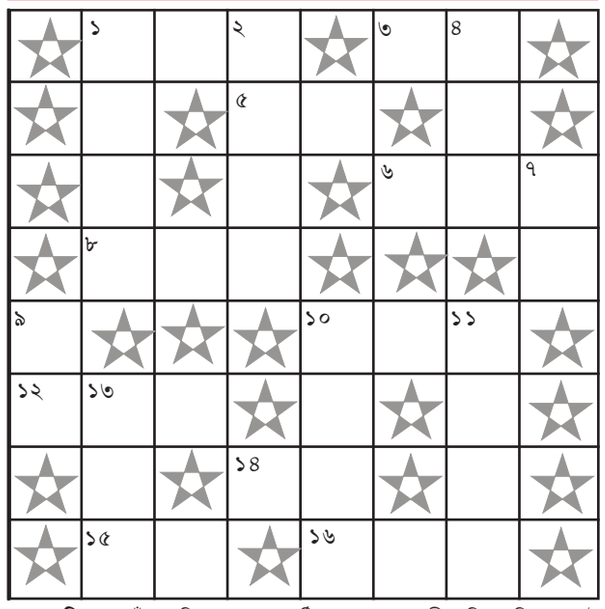

পাশাপাশি : ১। দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ৩। মাপ অনুযায়ী জমির পরিমাণ মোট ২০ কাঠা ৫। কোনও বিষয়ে সম্মতি দেওয়া ৬। দেওয়ালের খাড়াই বা লম্বরেখা মাপার জন্য রাজমিস্ত্রিরা যা ব্যবহার করেন ৮। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য উপযুক্ত বংশ বা ঘর ১০। যেটা ছাড়া প্রদীপ জ্বলে না ১২। গাছের শুকনো ফুল যা মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ১৪। বার্ধক্যজনিত স্থবিরতা ১৫। যে দেহে প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই ১৬। গায়ের জোরে সরদারি করতে অভ্যস্ত ব্যক্তি।

উপর–নীচ : ১। ঘাস দিয়ে তৈরি এক ধরনের পর্দা ২। যেখানে অপরাধীদের বন্দি করে রাখা হয় ৪। আহত, কাবু বা পরাস্ত ৭। নাকে পরার গয়না ৯। এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র, বালিশের ওয়াড়ও হতে পারে ১০। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকার জায়গা ১১। যে যন্ত্র দিয়ে উষ্ণতা মাপা হয় ১৩। লাঠির একদিকে লোহার তীক্ষ্ণ ফলাযুক্ত অস্ত্র।

সমাধান ■ ২৭৪৯

পাশাপাশি : ১। মওকা ৩। কোণঠাসা ৪। তরজা ৫। গঙ্গাধর ৭। কাচা ১০। কস্তা ১২। আচমকা ১৪। দেয়ালা ১৫। শূর্পণখা ১৬। পলতা।

উপর–নীচ : ১। মরীচিকা ২। কাতলা ৩। কোজাগরী ৬। ধনিক ৮। চামচ ৯। পাকাদেখা ১১। স্তাবকতা ১৩। গোলাপ।

আর্থিক অনিশ্চয়তায় মধ্যবিত্ত, সংকটমোচনের পথ অস্পষ্ট

মধ্যবিত্ত মানসিকতায় কমবেশি একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র কেনাকাটার প্রবণতা রয়েছে। ফলে তাঁদের ব্যয় কমানোর পরিসর বেশি। অর্থনৈতিক অনিশ্চতার সময় তাঁরাই যে খরচ সবচেয়ে বেশি কমাবেন, এনিয়ে খুব বেশি বিতর্কের অবকাশ নেই। লিখেছেন অদ্রি গড়াই।

২০২০–২০২১ সময়কাল নিঃসন্দেহে ভারতীয় অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থনীতিতে যে ধরনের সংকোচন নথিভুক্ত হয়েছে, উদারীকরণের পথে যাত্রা শুরু করার পর তার নজির নেই। গত এপ্রিল–জুন ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি কমেছে ২৩.৯ শতাংশ। বৃদ্ধির হার শূন্যের নীচে নেমে যাওয়ায় আর্থিক বৃদ্ধি নেতিবাচক স্তরে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, বৃদ্ধির বদলে ক্ষয় হচ্ছে। এই সংকোচনের কারণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে, মার্চে দেশে লকডাউন শুরু হওয়ার ফলে যে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছিল, জিডিপি'র পতনে তার প্রভাব দৃশ্যমান। অর্থনীতিবিদদের অনেকে আবার বেশ কয়েক ত্রৈমাসিক আগে থেকে হিসাব কষে বিশ্লেষণ করেছেন যে, জিডিপি'র পায়ের তলার মাটি আলগা হতে শুরু করেছিল ২০১৯–২০২০ অর্থবর্ষেই। তখনই বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করেছিল। করোনা–লকডাউন তাকে আরও কিছুটা টেনে নামিয়েছে মাত্র। তবে সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, লকডাউনের প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধির হার যতটা কমবে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল, বাস্তবের পতন সেই অনুমানকে ছাপিয়ে গিয়েছে। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, মুডিজের মতো আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থাগুলি পতনের মাত্রা কিছু কম হবে বলে আশা করেছিল। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, দেশি–বিদেশি সমীক্ষাকারীদের আশঙ্কাকে অনেকে পিছনে ফেলে দিয়েছে জিডিপি'র পতন।

বাজারে চাহিদা কমায় শিল্পক্ষেত্রে এবং তার ফলে সরকারের বিরাট বাজেট ঘাটতি এই পতনের সরলতম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু বাজারের চাহিদা হ্রাসের প্রধান কারণ, কর্মসংস্থানে সংকোচন ও আয়ের অনিশ্চয়তার জেরে খরচ কমানোর চেষ্টা। সমাজের প্রান্তীয় শ্রেণিকে বরাবরই ন্যূনতম রসদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাদের আয়ের সিংহভাগ খরচ হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে। মধ্যবিত্ত মানসিকতায় কমবেশি একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র কেনাকাটার প্রবণতা রয়েছে। ফলে তাঁদের ব্যয় কমানোর পরিসর বেশি। অর্থনৈতিক অনিশ্চতার সময় তাঁরাই যে খরচ সবচেয়ে বেশি কমাবেন, এনিয়ে খুব বেশি বিতর্কের অবকাশ নেই। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র পতনের হার পরিসংখ্যানগত দিক থেকে গত ৪ দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। উদারীকরণ শুরু হওয়ার পর জিডিপি'র মূল্যায়নে বেশ কিছু বদল ঘটেছে। ১৯৯৬ থেকে সেই পরিবর্তনের ধারা মেনে জিডিপি'র হিসাব কষা হচ্ছে। তাই নয়–এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এখনও পর্যন্ত জিডিপি'র হ্রাস–বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আলোচনা করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। চলতি আর্থিক বছরের শুরুতে অর্থনীতি যেভাবে প্রায় ২৪ শতাংশ হারে সংকুচিত হয়েছে, তাতে বছরের বাকি সময়ে তার মাথা তুলে দাঁড়ানো নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। আগামী ৩টি ত্রৈমাসিকে জিডিপি সামগ্রিকভাবে শূন্যের নীচে থাকলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যদিও আর্থিক বিশেষজ্ঞদের অনেকে 'ইতিবাচক' জিডিপি (শূন্যের ওপরে) হবে বলে আশাবাদী। আসলে সবটাই নির্ভর করছে শিল্প উৎপাদন ও চাহিদা বৃদ্ধির সমীকরণের ওপর।

লকডাউনের প্রভাব কাটিয়ে বৃহৎ শিল্পগুলি সবেমাত্র উৎপাদন বাড়াতে শুরু করেছে। কর্পোরেট কর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় উৎপাদকদের আর্থিক সুবিধা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। লকডাউন চলাকালীন উৎপাদন হ্রাসের দোহাই দিয়ে এধরনের অনেক সংস্থা কর্মী ছাঁটাই সহ নানাভাবে খরচ কমিয়েছে। সব মিলিয়ে বড় সংস্থাগুলির পুঁজিতে খুব বেশি টান পড়ার কথা নয়। তবে সবার ক্ষেত্রে এই একই যুক্তি আরোপ অতিসরলীকরণ হবে। গাড়ি ও আবাসন শিল্প সরকারি অক্সিজেন পাওয়া সত্ত্বেও লকডাউনের আগে থেকে ধুঁকছিল। লকডাউন পরবর্তী সময়ে সেই তালিকায় পর্যটন এবং খনিজ শিল্প যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে খনিজ শিল্পে এখনও সরকারি অংশীদারিত্ব বেশি হওয়ায় আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে। এর বাইরে থাকা বৃহৎ শিল্পগুলির সংকট অপেক্ষাকৃত কম। বৃহৎ উৎপাদকদের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্র। সামগ্রিকভাবে যা এমএসএমই নামে পরিচিত। অপেক্ষাকৃত কম পুঁজি বিনিয়োগ করে বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এই শিল্পের অন্যতম বিশেষত্ব। ভারতে মোট শিল্প উৎপাদনের অন্তত ৪৫ শতাংশ আসে এই এমএসএমই থেকে। রপ্তানি দ্রব্যের ৪০ শতাংশের জোগানদার অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। ৮ কোটির বেশি মানুষ এই ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। মোট জিডিপি'র প্রায় ৩৮ শতাংশ অধিকার করে আছে এমএসএমই। লকডাউনের ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে এই গোত্রের সংস্থাগুলির ওপর। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি জানিয়েছে, গত ৬ বছরে কতগুলি এমএসএমই বন্ধ হয়েছে, তার কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই।

বন্ধ হওয়া সংস্থার তথ্য না থাকায় এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সংকোচন নিয়ে আলোচনার আর অবকাশ নেই। কারণ, সংস্থার সংখ্যাগত হিসাব স্পষ্ট না হলে কর্মীসংখ্যার আভাস পাওয়া অসম্ভব। বাজার অর্থনীতির নিয়মে সংস্থা বন্ধ হওয়া ও নতুন সংস্থার সূচনা হওয়া একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। তবে কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি একসঙ্গে বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে যায় বা রুগ্ন হয়ে পড়ে, তাহলে তা অবশ্যই ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়। লকডাউন সেই ব্যতিক্রমকে চিহ্নিত করেছে। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপিতে সবচেয়ে ভালো ফল দেখা গিয়েছে কৃষিক্ষেত্রে। কৃষিতে বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের বিক্রিও সেভাবে প্রভাবিত হয়নি। ওষুধ শিল্পের বাজার কমার সম্ভাবনা নেই। বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষতি অন্যান্য শিল্পের তুলনায় কম। এর পরেও বৃদ্ধির হার ২৩.৯ শতাংশ কমে যাওয়ার অর্থ সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রের বিরাট ধাক্কা খাওয়া। যার মধ্যে অসংগঠিত তথা এমএসএমই ক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব তুলনায় বেশি। ভারতের অর্থনীতিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্বকে শুধু উৎপাদন বা আর্থিক লেনদেনের অঙ্কে বিচার করা যায় না। এর সঙ্গে কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও চাহিদার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও কিছুটা হলেও প্রান্তীয় শ্রেণির ক্রেতাদের ওপর নির্ভর করে গত কয়েক বছরে ভারতে ভোগ্যপণ্যের বাজার অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছে। বিদ্যুৎ, টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন, কেবল, রান্নার গ্যাসের মতো পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়েছে।

প্রশ্ন উঠবে এসব তো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র। আজকাল অনেকের কাছে এসব ন্যূনতম চাহিদার তালিকায় পড়ে। যদি তাই হয়, তাহলে তো লকডাউনের প্রভাব কেটে যাওয়ার পরেই এসব জিনিসের চাহিদা বাড়ার কথা। কিন্তু অঙ্কটা এত সহজ নয়। ভারতের মতো দেশে অর্থনীতির মাপকাঠির বেশ কয়েকটি স্তর ও উপস্তর রয়েছে। এখানকার মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে অন্যদেশের মধ্যবিত্তদের তুলনা চলে না। ১৩০ কোটি মানুষের দেশ ভারতে মধ্যবিত্তদের আনুমানিক সংখ্যা ৩০ কোটি থেকে ৩৫ কোটির মধ্যে বলে মনে করা হয়। এশিয়া, আমেরিকা বা ইউরোপের আর কোনও দেশে এত বিপুল সংখ্যায় মধ্যবিত্তের উপস্থিতি নেই। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে মধ্যবিত্তদের আর্থিক সক্ষমতার ফারাক ততটা নয়, যতটা ভারতে রয়েছে। এখানে কিন্তু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সামর্থ্যের ফারাকের কথা বলা হচ্ছে না। আলোচনা হচ্ছে মধ্যবিত্তদের সামগ্রিক আয়ের তফাত নিয়ে। ভারতে অঞ্চল ভেদে জীবনধারণের ব্যয়ে বিরাট পার্থক্য আছে। মুম্বই, পুনে, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, দিল্লি, গুরুগ্রামে থাকা–খাওয়ার খরচ কলকাতা, শিলিগুড়ি, পাটনা বা রাঁচির চেয়ে অনেক বেশি। ফলে কলকাতা, শিলিগুড়ির মতো শহরে যে আয় দিয়ে মধ্যবিত্তকে চিহ্নিত করা যায়, সেই টাকায় মুম্বই ও দিল্লিতে জীবনযাত্রার সমমান বজায় রাখা কঠিন। বেসরকারি ক্ষেত্রে একই ধরনের কাজে রাজ্যভিত্তিক বেতন বৈষম্য দেখা যায় সেই কারণেই।

উচ্চবিত্ত ও প্রান্তীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীগত আয়ের তফাত তুলনায় কম। বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে যাদের দৈনিক আয় ২ ডলার (১৪৬ টাকা) থেকে ১০ ডলারের (৭৩০ টাকা) মধ্যে, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়েন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাবে ১,০২৬ ডলার (৭৫ হাজার টাকা) থেকে ১২,৩৭৫ ডলার (৯ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত যাঁদের বার্ষিক আয়, তাঁরা মধ্যবিত্ত। এর মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত, দুই গোষ্ঠীকেই ধরা হয়েছে। আয়ের এহেন ফারাকের ভিত্তিতে মধ্যবিত্তদের একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের ১, ৫ বা আরও বেশি বছরের আয়ের ফারাক। ভারতে ভোগ্যপণ্যের প্রধান ক্রেতা এই মধ্যবিত্তরা। গাড়ি থেকে এসি, আবাসন থেকে রকমারি প্রসাধনী সামগ্রী, খেলনা, বাসনপত্র, সবেরই নিয়মিত ক্রেতা এঁরা। মধ্যবিত্তরা দেশের পরিষেবা শিল্পেরও মেরুদণ্ড। লকডাউন, আর্থিক মন্দার প্রভাব এদের ক্রয়ক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। উচ্চবিত্তদের কথা এক্ষেত্রে খুব বেশি আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশি হলেও, তাঁরা সংখ্যায় কম। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মূল্যায়ন অনুসারে ১২,৩৭৬ ডলার বা তার বেশি আয়ের ব্যক্তিরা ধনীদের তালিকায় পড়েন। ভারতে ধনীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষক সংস্থাগুলির পরিসংখ্যানে তফাত থাকলেও অধিকাংশই সংখ্যাটা ৭ কোটির আশপাশে বলে মনে করেন।

এঁদের মধ্যে অতিধনীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ সাধারণভাবে একলক্ষ ডলার (৭৩ লক্ষ টাকা) থেকে ১০ লক্ষ ডলারের (৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা) মধ্যে। ১৩০ কোটির দেশে এই অতিধনীরা মাত্র ১ শতাংশ। গত কয়েক বছরে ভারতে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়েছে। শেষ দু'দশকে সমাজের প্রান্তীয় শ্রেণির একটি অংশেরও ভোগ্যপণ্যের বাজারে অবদান তৈরি হয়েছে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের দৌলতে টিভি, ডিশ ও কেবল পরিষেবার পাশাপাশি মোবাইল সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও পরিষেবা সমাজের সর্বস্তরে পরিচিত হয়েছে। যদিও আয়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আজও আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির বড় অংশকে বাজার অর্থনীতির মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে মূলগতভাবে মধ্যবিত্তদের ওপর নির্ভরশীল বাজারে এইসময়ে ভোগ্যপণ্যের দ্রুত চাহিদা কমেছে। সবশ্রেণির অংশীদারিত্ব বাড়লে অর্থনৈতিক সংকোচনের মাত্রা সম্ভবত এমন পর্যায়ে পৌঁছোত না। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ লক্ষ কোটি টাকার লকডাউন–প্যাকেজে মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি ঘটেছে খুব নগণ্যই। কয়েকদিন আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মধ্যবিত্তদের স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ইঙ্গিত করেছিলেন। এ থেকে এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে, সরকার বাজারে চাহিদা কমার এক গুরুতর কারণকে চিহ্নিত করেছে। তবে এই সংকট কাটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রূপরেখাটি এখনও অস্পষ্ট।

> **বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদদের সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতে যাঁদের দৈনিক আয় ২ ডলার (১৪৬ টাকা) থেকে ১০ ডলারের (৭৩০ টাকা) মধ্যে, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়েন। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাবে ১,০২৬ ডলার (৭৫ হাজার টাকা) থেকে ১২,৩৭৫ ডলার (৯ লক্ষ টাকা) পর্যন্ত যাঁদের বার্ষিক আয়, তাঁরা মধ্যবিত্ত। এর মধ্যে নিম্নমধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত, দুই গোষ্ঠীকেই ধরা হয়েছে।**

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

সিকিমই তো গোর্খা রাজ্য

সম্প্রতি আদতে মণিপুরের বাসিন্দা তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট লোকসভায় গোর্খাল্যান্ড গঠন করার দাবি তুলেছেন। স্বাধীনতার পর ভারতের প্রদেশগুলি গঠন হয়েছিল ভাষার ভিত্তিতে। সেই পথ অনুসরণ করে পরে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলনে সাবেক অনেক বড় প্রদেশ ভেঙে বহু রাজ্য তৈরি হয়েছে। জাতিসত্তার দাবি মেনেই কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মণিপুর, মেঘালয় ইত্যাদি বহু রাজ্য গঠন হয়েছে। এইসব আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন ভারতীয় নাগরিক। গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলনকারী নেপালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা কিন্তু ভারতীয় নন। দার্জিলিং জেলায় ১৯৫১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ৫০ বছরে নেপালিভাষীর বৃদ্ধির হার ৭৭৫.১৬ শতাংশ এবং এই সময়ে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৮৪.১৯ শতাংশ। নেপালিভাষীদের ওই অসম্ভব বৃদ্ধি হয়েছে নেপাল থেকে ভারতে লাগাতার অনুপ্রবেশের ফলে। অনেকে আবার ভুটান থেকে বিতাড়িত হয়ে ডুয়ার্স ও তরাইয়ে বসতি স্থাপন করেছেন।

১৯৯১ সালের ১৮ জুলাই সুবাস ঘিসিং তদানীন্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার টিএন সেশনকে চিঠি লিখে দাবি করেছিলেন যে, দার্জিলিং জেলার লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনগুলি অবৈধ। কেননা, ভোটার লিস্টে বহু বিদেশির নাম আছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ১৮৩৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সিকিমের রাজা চেগিয়াল দার্জিলিং ভূখণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ইজারা দিয়েছিলেন। তখন দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা ছিলেন ১০০ জন লেপচা। পরে নেপালিরা রাস্তা ও চা বাগানে কাজ করতে আসেন। ১৯৫০ সালের ভারত–নেপাল মৈত্রী চুক্তিতে নেপালিদের ভারতে জীবিকা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

১৯৮৮ সালের ২৩ অগাস্ট ভারত সরকারের প্রকাশিত একটি বিশেষ গেজেট নোটিফিকেশনে বলা হয়েছিল, যেসব নেপালিভাষী ১৯৪৫ সালের ২৬ জানুয়ারির আগে ভারতে এসেছেন তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরসূরিরা ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। খবরে প্রকাশ, সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিং কিছুদিন আগে গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, সিকিমের জনসংখ্যার ৬২.৬১ শতাংশ নেপালি। তাহলে ভারতে তো গোর্খাল্যান্ড অর্থাৎ গোর্খাদের জন্য রাজ্য আছেই। সিকিমই তো গোর্খাল্যান্ড।

ধ্রুব সরকার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

একযাত্রায় পৃথক ফল

২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় এখনও পর্যন্ত যেসব বিষয়ে মেধাতালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে অ্যানথ্রোপলজি প্রথম এবং ভূগোল সর্বশেষ। ২৭ মে, ২০১৯ থেকে শুরু করে ৯ মার্চ, ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ৪৫টি বিষয়ে মেধাতালিকা